জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

দেরিদার বিনির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম*

Abstract

Jacques Derrida was One of the most influential and leading philosopher on 20th century. His influence touched many field of academic such as linguistics, literature, anthropology, music, law, architecture and so on. His influence also continues into the 21stcentury. He is most familiar for his Ôdeconstruction' which that once on interpretive approach and a critique of western metaphysics. Although Derrida used the word deconstruction in his three books which are *Of Grammatology*, *Writing and Difference* and *Speech and Phenomena* (and all this three books published in 1967), but he first introduce this concept in *Of Grammatology*.Where he analyzed the interplay between language and the construction of meaning. Derrida's deconstruction is basically critique of western thoughts and he presented his own views as counter discourse. This paper presents early Derrida's deconstruction and analysis some related term whats are exposed by him to focusing deconstruction. And in this connection also this paper explain Derrida's contrary viewsagainst some philosophers, linguist and anthropologist.

চাবিশব্দ: কেন্দ্র, কাঠামো, পাঠ্য, ভিন্নতা, অর্থ, মুক্ত-খেলা

ভূমিকা

দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব কোনও দার্শনিকের মত বা তত্ত্বই চিরসত্য হিসেবে টিকে নেই। মত প্রতিমত ও ভিন্নমতের মধ্য দিয়ে দর্শনের ইতিহাস অগ্রসরমান। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিস জগতের মূল সত্তা সম্পর্কিত যে বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যার অবতারণা করেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি 'পানি'কে জগতের মূলসত্তা হিসেবে গ্রহণ করে যে একটি জড়বাদী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা পরবর্তী দার্শনিকদের দ্বারা সমালোচিত ও বর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যেমন অ্যানাক্সিমেন্ডার জগতের মূল সত্তা হিসেবে সীমাহীন বস্তু (Boundless Matter) অ্যানাক্সিমেনিস বায়ু, পিথাগোরীয়রা সংখ্যা, এলিয়াটিকরা সত্তা (Being), হিরাক্লিটাস আগুন, এম্পিডক্লিস চারটি উপাদান (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু), ডেমোক্রিটাস পরমানুর কথা বলেছেন।[১] কিন্তু কারোর মতই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একজনের মত বা তত্ত্বকে অপরজন সমালোচনা করে বর্জন করেছেন অতঃপর নিজেই আবার ভিন্ন কোনো মত বা তত্ত্ব প্রদানের চেষ্টা করেছেন। অথচ প্রত্যেক দার্শনিক বা দার্শনিকগোষ্ঠী তাদের মত বা তত্ত্বকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে। কিন্তু দর্শনে চূড়ান্ত সত্য বলে আসলে কিছু নেই। বস্তুত জগত-জীবন সম্পর্কিত যেকোনোচিন্তার মধ্যেই একটা অনিবার্য ফাঁক থেকে যায়। আর এ জন্যই দার্শনিকরা পুরাতনকে বর্জন করে নতুন তত্ত্ব প্রদান করেন। আর এই নতুন তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে কেবল পুরাতন তত্ত্ব বর্জিতই হয় না; এর সাথে সাথে নতুন তত্ত্ব গৃহীতও হয় বটে। পুরাতনের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুনের সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে destruction

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

এবং construction, আর এই দুটো মিলিয়ে হয় de-construction। আর এটাই হল জ্যাক দেরিদার deconstruction। বাংলায় অনেকে deconstructionশব্দটিকে বিনির্মাণ বলে অভিহিত করেছেন।[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেরিদা যে বিনির্মাণের কথা বলেছেন তার সূত্রপাত দর্শনের ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময় থেকেই। তবে দর্শনে যা জগৎ ভাবনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, দেরিদার বিনির্মাণে তা প্রয়োগ করা হয়েছে দর্শনের উপর। তিনি প্রশ্ন তোলেন দর্শনের প্রচলিত রীতি, প্রচলিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে। আর এজন্যই দেরিদার লেখালেখিতে মূলতঃ রয়েছে অন্যান্য দার্শনিকের ভাষ্য কিংবা প্রতিষ্ঠিত দর্শনের সমালোচনা। দর্শন সাহিত্যে তাঁর তিনটি বিখ্যাত বই হল- (i) *Of Grammatology* (ii) *Writing and Difference* এবং (ii) *Speech and Phenomena*। ১৯৬৭ সালে এই বই তিনটি প্রকাশের মধ্য দিয়েই মূলত বিনির্মাণ শব্দটির সূত্রপাত হয় এবং এরপর থেকেই দার্শনিক আন্দোলনে একটি নতুন মুখ হিসেবে দেরিদার পরিচিতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : উত্তর আধুনিক দর্শনে দেরিদার প্রভাব অপরিসীম। দেরিদার বিচরণ চিন্তার নানা ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিনির্মাণ (Deconstuction)। তবে বিনির্মাণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাষা ও সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে যে একটা বিভাজন রয়েছে তা তিনি তুলে দিয়েছেন। ফলে তিনি একজন সাহিত্যিক না দার্শনিক তা বোঝা অনেক সময় মুশকিল হয়ে পড়ে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেরিদা একটা নিজস্ব শৈলী ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে চমকতা এবং নানা ধরনের কারুকাজ। তাঁর এই ভাষা মূলত রূপক এবং প্যারাডক্স এর সমন্বয়ে উপস্থাপিত। ভাষা খেলায় তাঁর এই শৈল্পিক উপস্থাপনার জন্য প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলো তাঁর দর্শনে স্থান পায়নি। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর দর্শন অত্যন্ত দূর্বোধ্য এবং জটিল বলে মনে হয়। সুতরাং দেরিদার বিনির্মাণ দর্শনকে সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি: একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে। আলোচ্য 'দেরিদার বিনির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে দেরিদার বিনির্মাণ দর্শনের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আবার দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ দর্শনে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, গবেষণা প্রবন্ধে সেসব প্রত্যয়গুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধ রচনায় একদিকে যেমন বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি (Explanatory Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

দেরিদার দর্শন বেশিরভাগ সময় ঘুরপাক খেয়েছে ভাষা কেন্দ্রিক অধিবিদ্যার সমালোচনার মধ্যে। তিনি মনে করেন, ভাষা কেন্দ্রিক অধিবিদ্যার বিষয় থেকে মানুষ কখনও সত্যের সন্ধান পায়না। হেগেল সমস্ত জগতকে যুক্তির প্রকাশ বলে মনে করতেন। মানুষের জীবনকেও তিনি যুক্তির কাঠামোতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি ছাড়াও মানুষের জীবনে আরও অনেক উপাদান আছে। কিন্তু হেগেল সেগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের মতে, মানুষের জীবনে উদ্বেগ আছে, আবেগ আছে এবং তার অস্তিত্বের ও স্বাতন্ত্রের উপলব্ধি আছে। আর এর সবগুলো মিলিয়ে রচিত হয় তার জীবনের সত্য। মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের অধিবিদ্যা যুক্তিনির্ভর এবং বাক্‌কেন্দ্রিক। দার্শনিক যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাকে তাঁর বাক্‌বা উক্তির মধ্য দিয়ে

প্রকাশ করেছেন । কিন্তু যুক্তি যে মানুষের সকল দিকের প্রতি আলোকপাত করতে পারে না, তা আমরা অস্তিত্ববাদী দর্শনে দেখেছি। কাজেই দেরিদা যুক্তি নির্ভর বাক্ কেন্দ্রিক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এমন দর্শনের কথা বলতে চান, যা জীবনের সমস্ত দিকের প্রতি আলোকপাত করে। জীবনে বাক্ বা উক্তি ও লেখার পারস্পরিক নির্ভরতার বন্ধনে গড়ে উঠতে পারে প্রকৃত দর্শন। তাই কেবলমাত্র বাক্ বা উক্তির প্রাধান্যকে বর্জন করে বাক্ ও লেখার সৌহাদ্যপূর্ণ অবস্থানকে আমরা জীবন রচনায় আমন্ত্রণ জানাতে পারি। আর এই প্রাধান্য বর্জন করাটাই হলো দেরিদার বিনির্মাণের গল্প। দেরিদার মতে, দর্শনে একটি যুক্তি পরস্পরা কাজ করে এবং এই যুক্তিকে নানারকমভাবে ব্যাখ্যা (Interpretation) করা যেতে পারে।[৩] সাধারণভাবে ব্যাখ্যার (Interpretation) উদ্দেশ্য হলো টেক্সটের অন্তর্নিহিত অর্থ সুস্পষ্ট করা এবং একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় অর্থ বা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বরং ব্যাখ্যা এখানে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সুতরাং একটা ব্যাখাকে বর্জন করে আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা আবার সেটাকে বর্জন করে নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। এই গ্রহণ-বর্জন রীতিটাই হলো দেরিদার বিনির্মাণের অনুষঙ্গ।

দেরিদা Deconstruction বা বিনির্মাণ পদটি প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর *Of Grammatology* গ্রন্থে ১৯৬৭ সালে, যখন তিনি বোধগম্য ভাষা হিসেবে কথ্য ভাষার চেয়ে লেখ্য ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, "Writing thus enlarged and radicalized, no longer issues from a logos. Further, it inaugurates the destruction, not the demolition but the de-sedimentation, the de-construction, of all the significations that have their source in that of the logos."[৪] এখানে দেরিদা বিনির্মাণকে বোঝাতে চেয়েছেন ভাষার মাধ্যমে। মূলত কেউ যখন বোধগম্য ভাষায় কোনো কিছু লিখে তখন তার অর্থের মধ্যে কি ঘটে?দেরিদার মতে, ভাষাকে যখন লেখায় রূপদান করা হয়, তখন ভাষা ব্যবহারকারীর চিন্তা থেকে তাঁর অর্থের উৎপত্তি ঘটেনা। কারণ সেই চিন্তা ততক্ষণে ভাষার মধ্যে একটা স্থান দখল করে নেয়। প্রত্যেক ভাষা ব্যবহারকারী একটা পদ্ধতির মধ্যে বাইরে থেকে অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। টেক্সট বা পাঠ্যের অর্থ প্রকৃতপক্ষে লেখকের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে না। বরং টেক্সটের অর্থ আবশ্যিকভাবে নির্ভর করে ব্যাখ্যা, আলোচনা এবং অনুবাদের কিছু মাত্রার উপর। সুতরাং লিখিত ভাষার অর্থ আবশ্যিকভাবে পাঠকের সক্রিয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। আর এজন্যই লিখিত ভাষা বা টেক্সটের অর্থের ক্ষেত্রে বিনির্মাণ তার স্থান দখল করে। বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য দেরিদার মৌখিক ও লিখিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য করনের বিষয়টিকে বিবেচনা করা যাক। দেরিদা যুক্তি দেখান যে, মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই মৌখিক ভাষাকে ভাষার প্রাথমিক ধরণ বা মুখ্য ভাষা হিসেবে মনে করে[৫] এবং লিখিত ভাষাকে মৌখিক ভাষার অধীন বা গৌণ ভাষা হিসেবে মনে করে ("a particular, derivative, auxiliary form of language in general.")।[৬] দেরিদার মতে, মৌখিক ভাষাকে ঐতিহাসিকভাবে চিন্তা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এখানে বক্তার সামনে শ্রোতা উপস্থিত থাকে। বক্তার চিন্তা যদি জোরে উচ্চারিত হয় এবং শ্রোতা তা শ্রবন করে এবং শ্রোতার মধ্যে বক্তার চিন্তা বোঝার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, তখন বক্তা সেখানে উপস্থিত থাকে বলে তার পূর্ববর্তী উক্তির অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে।

দেরিদা যুক্তি দেখান যে, চিন্তা হিসেবে মৌখিক ভাষা নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। [৭] মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশিত (signified) অর্থ এত তাৎক্ষণিকভাবে বোঝানো হয় যে, সেখানে যে ভাষাতাত্ত্বিক নির্দেশক (signifier) জড়িত ছিলেন এবং যিনি মৌখিক শব্দ করেছিলেন তাঁকে ভুলে যাওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার। আর তাই লিখিত চিহ্নই প্রকৃতপক্ষে ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে দেরিদা মনে করেন। সুতরাং দেরিদা মৌখিক ভাষার সাথে সরাসরি, অর্থের সমস্যাহীন তত্ত্ব এবং নির্দেশককে (signifier) ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোকে সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৮]

অন্যদিকে লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে লেখক সাধারণত অনুপস্থিত থাকেন। এক্ষেত্রে পাঠক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে টেক্সটের(পাঠ্যের) অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য লেখকের উপর নির্ভর করতে পারেনা। আর অনেকটা সেকারণেই লিখিত ভাষাকে চিহ্ন পদ্ধতির ভাষা হিসেবে পরিজ্ঞান করা হয়। চিহ্নপদ্ধতি হিসেবে নির্দেশকগণ (signifier) উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু নির্দেশিত বিষয়ের অর্থ (meaning) কেবলমাত্র অনুমিত। কার্যত এখানে ভাষার নির্দেশকের দ্বারা যা নির্দেশিত হচ্ছে তার অর্থ পাঠকের অনুবাদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মৌখিক ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষার বিশেষত্ব হলো এখানে ভাষার মধ্যে নির্দেশকগণ উপস্থিত থাকে, কিন্তু নির্দেশিত বিষয়ের অর্থ অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং শব্দের অর্থ এখানে পাঠকের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। আর যেহেতু শব্দের অর্থ বা টেক্সটের অর্থ পাঠকের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, সেহেতু প্রত্যেক পাঠকই টেক্সটের অর্থ ভিন্নভাবে বিনির্মাণ করতে পারে।[৯]

দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ এর আলোচনায় ভাষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা ভাষা মানুষের জীবন পরিসরে এমন এক প্রাকটিস, যার মধ্যে আমাদের অনেক কিছু উন্মোচিত। দেরিদার মতে, ভাষা হলো দ্যোতক পুঞ্জের অনন্ত উল্লাসের মঞ্চ। তিনি মনে করেন, ভাষা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভাষার বাইরে কিছু নেই; আর ভাষার অর্থ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অর্থের বাইরে কিছু নেই। অর্থের কোনো শেষ নেই এবং শেষ খুঁজতে যাওয়াও উচিত নয়। কেননা কন্টেক্সট (Context) পরিবর্তনে অর্থ বদলে যায়। যিনি টেক্সট রচনা করেন তিনি টেক্সটের অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন না। টেক্সট এর অর্থ অবশ্যই আছে কিন্তু অর্থ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কোনো সূত্র নেই। প্রতিমুহূর্তেই নতুন অর্থ তৈরীর সম্ভাবনা থাকে এবং প্রতিটি নব উদ্ভাবিত অর্থের সঙ্গে পুরনো অর্থের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অর্থের এই অস্থিরতা যে কোনো টেক্সটের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। দেরিদার এই টেক্সট সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সুইস ভাষাবিদ ফার্ডিনান্ড ডি সস্যুর এর নিকট থেকে এসেছে। সস্যুরকে কাঠামোবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে মনে করা হয়। সস্যুরের মতে, ভাষা কোনো টেক্সটের অর্থ তৈরি করে না; বরং টেক্সটের অর্থ উদঘাটন করাই হলো ভাষার কাজ। সুতরাং বলা যায় ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই টেক্সটের অর্থ অবস্থান করে। তাঁর মতে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষাচিহ্ন বা শব্দ, ভাষা-কৌশলের আওতাধীন অন্যান্য ভাষা-চিহ্নের সাথে তুলনা করার পরই অর্থবোধক হয়।[১০] যেমন আমরা যখন 'বাঘ' শব্দটি উচ্চারণ করি তখন তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটি তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন কৌশল গ্রহণ করি। যেমন- বাঘ যেহেতু গরু নয়, মানুষ নয়, ঘোড়া নয় সেহেতু 'বাঘ' অর্থ বাঘ। দেরিদা সস্যুরের এই মত গ্রহণ করলেও তত্ত্বটির বিস্তার ঘটান। তিনি মনে করেন, কোনো একটি ভাষা ব্যবস্থার আওতাধীন ভাষাচিহ্নের তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ মানুষকে জীবন জগত সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের অর্থ প্রদান করে। সস্যুরের মতে, অর্থ উদ্ধারের এই প্রক্রিয়ায় মানবিক চেতনার ক্রিয়াই থাকে মুখ্য যার ফলে জগৎ জীবন সম্পর্কিত বিষয়ের অর্থ

প্রাপ্তির সাথে সাথে একজন মানুষ তার উপস্থিতি বা অস্তিত্বকে অনুভব করে, তৈরি করে এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ। এই অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগতের স্রষ্টা মানুষ- 'আমি আছি তাই সবকিছুর অস্তিত্ব আছে, সবকিছুর অর্থ আছে' এমন একটা উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত চিন্তার জাল বিস্তার করে। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি "Cogito ergo sum" (আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) এর মাধ্যমে অহং-সত্তাকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু দেরিদার মতে,অহং-সত্তা কেন্দ্রিক এই চিন্তা প্রকৃত সত্য কিংবা অর্থকে উদ্ধার করে না। কারণ প্রকৃত সত্য ও অর্থ এক সময়হীন ভাষার শৃংখলে আবদ্ধ। [১১] অহং কেন্দ্রিক উচ্চারিত (মানুষের) মুখের ভাষা তাৎক্ষণিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করলেও লিখিত ভাষা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে পারে না। কারণ লিখিত ভাষা একটা সময় কেন্দ্রিক এবং বিভিন্ন সময় তা বিভিন্ন দেশ কালের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয় বলে তা' বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা বা অর্থ তৈরি করে। [১২] লিখিত ভাষার এই দেশ কাল কেন্দ্রিক অর্থের ভিন্নতার বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য দেরিদা ডিফারেন্স (diffe′rance) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডিফারেন্স (diffe′rance) শব্দটির মূলে আছে differ যার অর্থ ভিন্নতা বা পার্থক্য। দেরিদার মতে, সমস্ত ভিন্নতা এবং সমস্ত অস্তিত্বের উৎপত্তি ঘটে ডিফারেন্সের ক্রিয়াকলাপ হতে। (All difference and all presence arise from the operation of diffe′rance).[১৩] তিনি যুক্তি দেখান যে, ডিফারেন্স (diffe′rance)সমস্ত দর্শনেই পরিব্যাপ্ত। কারণ সকল দর্শনই ভাষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতি হিসেবে নির্মিত হয়। ভাষার জন্যও ডিফারেন্স আবশ্যক, কারণ "অধিবিদ্যায় যাকে চিহ্ন (sign) বলা হয় (নির্দেশিত এবং নির্দেশক signified and signifier)" তাও ডিফারেন্সের তৈরি।[১৪] ভাষার মধ্যে যে অস্থির ক্রীড়া চলে এটা তারই সৃষ্টি এবং এর ফলে কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। কোনো ধারণার সঠিক সংজ্ঞা প্রণয়ন করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং বিনির্মাণের তাত্ত্বিক ভিত্তির চাবিকাঠি হল এই ডিফারেন্স।

দেরিদার লেখার মধ্যে উত্তর কাঠামোবাদ অত্যন্ত গভীরভাবে চিহ্নিত আছে, আর এর ব্যাখ্যামূলক কৌশল হলো তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্ব, যা সমালোচনামূলকও নয় আবার বিরোধিতাপূর্ণও নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল অর্থপূর্ণ আলোচনার আদি প্রতিষ্ঠাতাকে হ্রাসকরণের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করা। তাঁর এই কাজের প্রথম কারণ ছিল নিজস্ব অর্থ এবং সম্ভাব্য অর্থকে চূড়ান্তভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। দেরিদার মতে, অর্থ (Meaning) এবং ভাষা একে অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে এবং ভাষা অর্থের বাহক নয় বরং অর্থের বিনাশকারী। বিনির্মাণ তত্ত্ব আবশ্যিকভাবে পাঠ্যের ব্যাখ্যাকারী (Textural Interpretation), যা অবসানের অসম্ভাব্যতার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। [১৫] অর্থাৎ কোনো টেক্সটের অর্থের শেষ বা চূড়ান্ত অর্থ বলে কিছু একটা যে আছে তা এখানে অস্বীকার করা হয়। কোনো একটি বাক্যের বা শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে প্রচলিত মতের সাথে দেরিদার মতের যে ভিন্নতা তাই ডিফারেন্স নামে অভিহিত। প্রচলিত অর্থে মনে করা হয় যে, কোনো একটি বাক্যের নিজস্ব একটি অর্থ আছে। বাক্য যেন জানে সে কে, বলতে পারে কি তার পরিচয়, বলতে পারে তার নিজের অর্থ। বাক্যের নিজের যে অভিন্নতা (identite) যে আত্মপরিচয় তা' নিজের অর্থেই চেনানো সম্ভব। কিন্তু দেরিদা এখানেই ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, কোনো কিছুই তার আত্মপরিচয়ে পরিচিত হতে পারে না, বা নিজের কাছে নিজেই উপস্থিত থাকতে পারেনা। বরং নিজে নিজের কাছে না থেকে নিজ থেকে একটু দূরে অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে বলা

যায়, 'এটা হয় একটি চেয়ার'– এই বাক্যের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ বাংলায় দেয়া সম্ভব নয়। বরং এর উত্তর দিতে হলে ভিন্ন একটি ভাষায় দিতে হবে। যেমন ইংরেজি ভাষায় বললে "দিস ইজ এ চেয়ার (This is a chair) এবং এই বাক্যের মাধ্যমে মূল বাক্যের পরিচয় বা অর্থ পাওয়া গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বাক্যের অর্থ বা পরিচয় তার নিজের মধ্যে (অভিন্ন) থাকে না; বরং অন্য ভাষার বাক্যের মধ্যে তার অর্থ বা পরিচয় নিহিত থাকে। আর এজন্যই দেরিদার ভাষ্যকে বলা হয় অভিন্নতার (identite′) দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ভিন্নতার(diffe′rance) দিকে ঝুঁকে যাওয়া ভাষ্য। [১৬] কেউ-ই তার নিজের ধ্রুব পরিচয় দিতে পারে না। কারও অন্তরের আত্মতত্ত্ব খুঁজে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং খুঁজে দেখতে হয় কোথায় সে আপন হতে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পূর্বে উল্লিখিত চেয়ারের উদাহরণে প্রথমতা থেকে সরে এসেছে(diffe′rance) বলেই "দিস ইজ এ চেয়ার" মাধ্যমে (ভিন্ন ভাষা) তার পরিচয় দিতে পেরেছে। ফরাসি আত্মপরিচয় বাচক বা অভিন্নতা বাচক শব্দidentite′র বিপরীত শব্দ হলো diffe′rence। Diffe′ranceএর প্রচলিত বানান ence এর স্থলে দেরিদা ance লিখেছেন। এর ফলে শব্দটির ফরাসি উচ্চারণ (দিফেরাঁস) না পাল্টালেও অর্থ পরিবর্তনের আভাস কিন্তু রয়েছে। দেরিদা এখানে বলতে চেয়েছেন, লিপি নিছক কথ্য ভাষার গোলাম নয়; বরং নিজস্ব কিছু খেলাও সে খেলতে জানে। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে এই যে মুক্ত খেলা (Free Play)তারই দৃষ্টান্ত হলো দেরিদার aবানান ওয়ালা diffe′rance শব্দটি।[১৭] বস্তুত দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্বে কথ্য ভাষার (মুখের ভাষা) চেয়ে লেখ্য ভাষার (লিখিত ভাষা) উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। কথা বলার সময় বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই উপস্থিত থাকেন বলে বক্তা, শ্রোতা এবং কথার মধ্যে স্থান কালের কোনো দূরত্ব থাকে না। এখানে বক্তা জানে, সে যা বলছে, শ্রোতা তা শুনছে। ফলে বক্তা যা বলতে চায়, যা প্রকাশ করতে চায় তার অর্থ শ্রোতা বোঝার চেষ্টা করে। তবে অর্থ শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হলে বক্তা সেখানে উপস্থিত থাকেন বলে সে নিজেই সে অসুবিধা দূর করতে পারে। কিন্তু কোন লেখা যখন পাঠক পড়েন, তখন লেখক সেখানে উপস্থিত থাকেন না। ফলে অনেক সময় যখন পাঠক লেখকের অভিপ্রায় বুঝতে পারেন না, তখন সেটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে (লেখককে) পাওয়া যায় না। এজন্য পাশ্চাত্যে লেখার চেয়ে কথাকে অধিক মূল্য দেয়া হয়েছে।[১৮] কিন্তু দেরিদার মধ্যে বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কথা ও লেখার মধ্যে লেখার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার দেরিদার এই যে বিনির্মাণ তার পিছনে এক গভীরতর যুক্তি রয়েছে। আর তা হল কোনো একটি শব্দের যে অর্থ তা সব ক্ষেত্রেই এক হবে। [১৯] ফলে কোনো বক্তা সেই কথাটি বলার জন্য যদি উপস্থিত নাও থাকেন, তাঁর অভিপ্রায় যদি আমরা জানতে না পারি, তবুও সেই কথাটির অর্থের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বোঝার জন্য বক্তার উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলেই শব্দের অর্থ আয়ত্তে আসবে। লিখিত ভাষা এই সত্যটি তুলে ধরে বলেই দেরিদা লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[২০]

দেরিদার বিনির্মাণ সকল রকমের কাঠামোর বিরুদ্ধে। তিনি ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ (Structure Sign and Play in the Discourse of Human Sciences) নামক প্রবন্ধে কাঠামোবাদের (Structuralism) বিরুদ্ধে তাঁর মত তুলে ধরেছেন। কাঠামোবাদ শব্দটির মধ্যে কাঠামো বা একটি ছকের ধারণা রয়েছে। কাঠামোবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন সস্যুর, ফ্রয়েড, লেভি-স্ট্রস, অ্যালথুসার প্রমূখ। দার্শনিকদের দর্শন বিষয়ক আলোচনাগুলো একটা

স্ট্রাকচার বা কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটা কাঠামো রয়েছে, আবার মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের আরেকটি কাঠামো রয়েছে। অ্যালথুসার, মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক মতবাদকে হেগেলীয় মতবাদ থেকে আলাদা করে মার্কসীয় কাঠামোবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। দেরিদার মতে, হেগেলের দর্শনের একটা কাঠামো বা ছক রয়েছে, আবার কাঠামোবাদীদের দর্শনের আর এক ধরনের কাঠামো বা ছক। তবুও ছক। দেরিদা এই কাঠামোর বিরুদ্ধাচারন করে বলেন, দর্শনকে বা কোনো আলোচনাকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছকে ধরে রাখা যায় না। [২১] হেগেলীয় দর্শন একটি সামগ্রিক ধারণার কথা বলে, যার অংশে থাকে মানুষ। যেমন রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক রূপ, যার অংশ হলো নাগরিক। আবার বাজার যদি হয় একটি সামগ্রিক রূপ, তবে তার অংশ হল মালিক ও শ্রমিক। উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রিক ধারণার কেন্দ্রে থাকে মানুষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হেগেলীয় দর্শন একটি ধারণার মধ্য দিয়ে সমগ্রকে প্রকাশ করে, যার নাম হলো ইউনিভার্সাল বা সার্বিক। এই সার্বিক বা ইউনিভার্সাল হলো উৎস, আর এই সার্বিক উৎস থেকে পার্টিকুলার বা বিশেষরা প্রবাহিত হয়। মার্কসবাদে অর্থ (money) হলো উৎস, আর এই অর্থনৈতিক উৎস থেকে উপরিকাঠামো হিসেবে রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বের হয়ে আসে। সুতরাং সার্বিক বা ইউনিভার্সাল হলো একটি সেন্টার বা কেন্দ্র যা পার্টিকুলার বা বিশেষগুলোকে ধরে রাখে। [২২] দেরিদার কাঠামোবাদ বিরোধী বিনির্মাণ দর্শন মূলত প্লেটোনিক দর্শনের এক ধরনের সমালোচনা। কেননা প্লেটোনিক দর্শন অনুসারে কেবলমাত্র সার্বিকের অস্তিত্ব আছে; বিশেষগুলো সার্বিকের ছায়ামাত্র। আবার মানবিক চিন্তা-ক্রিয়ায় অহং উপস্থিত থাকে বলে মানুষ সবসময় তার পছন্দমত একটি সেন্টার বা কেন্দ্র নির্ধারণ করে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণে মানবিক চেতনা সবসময় অহং কেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্য (Binary-opposition) কে কেন্দ্র করে অগ্রসর হতে চায়। [২৩] এই যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো হলো অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব, সাবিক/বিশেষ, ভালো/মন্দ, চিরন্তন/পরিবর্তন, কথা/লেখা, যুক্তি/আবেগ, সংস্কৃত/প্রাকৃত, নর/নারী ইত্যাদি। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো পরষ্পর বিপরিত এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে উঁচু স্তরের। ফলে প্রথমটির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে দেরিদার মতে, মানবিক চিন্তা কাঠামোয় যুগ্ম-বৈপরীত্যের ধারণায় পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে একটা পর্যায়ে এসে নিচু স্তরের ধারণা উঁচু স্তরের ধারণায় পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং প্লেটোনিক দর্শনে যে বিশেষগুলোকে সার্বিকের ছায়ামাত্র বা গুরুত্বহীন মনে করা হয়েছে, তা আসলে গুরুত্বহীন নয়। বরং সার্বিক এবং বিশেষ উভয়ই সত্য, উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, কাঠামোবাদ অনুসারে, উৎস বা সেন্টার বলে কিছু নেই। প্রতিটি কাঠামোই অন্য কাঠামোগুলির দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং সার্বিক বা উৎস বা সেন্টার নেই। কিন্তু দেরিদার মতে,সেন্টার আছে, কেননা কাঠামোগুলো মিলেমিশে এক সমাজ হয়ে আছে। বস্তুত মানবিক চিন্তায় উৎস বা সেন্টার বিহীন কোনো কিছুর ধারণা করা একবারেই অসম্ভব। অ্যালথুসারের (Althusser) কাঠামোবাদ সমাজকে অনেকগুলি কাঠামোর কাঠামোরূপে দেখে। অর্থাৎ এমন কিছু একটা আছে যা কাঠামোগুলোকে ধরে রাখে, অথচ কাঠামোবাদ তাকে ব্যাখ্যা করেনা। [২৪] আর যা কাঠামোগুলোকে ধরে রাখে সেটাই হলো সেন্টার বা উৎস। সুতরাং কাঠামোবাদেও একটি সেন্টার আছে; অথচ তা আলোচনার বাইরে থাকে। হেগেলের কাঠামোবাদ সেন্টারটিকে ধারণ করে কিন্তু কাঠামোবাদ তাকে অস্বীকার করে। দেরিদা সেন্টারটিকে অস্বীকার না করে স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আলোচনায় সবকিছু মিলবে এমনটা নয়; কিছু জিনিস বাইরে থেকে যেতেই পারে, অথচ তার চিহ্ন রেখে যায় আলোচনার অভ্যন্তরেই। আবার এই গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটি সাবজেক্ট করে বলে পুরো ব্যাপারটিই সাবজেক্টিভ।[২৫] আরেক কাঠামোবাদী ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রস

(Claude Levi-Strauss) আদিম মানুষের (savage) সমাজ কাঠামোকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন তাদের মনন এবং সংস্কৃতি দিয়ে। তাঁর মতে, সার্বিক (Universal) নিয়মাবলি দিয়ে আদিম মানুষের সমাজ কাঠামো বোঝা যায় না, বরং মনন এবং সংস্কৃতি দিয়ে তা বোঝা যায়। আর এই আদিম মানুষের মননের একটা কাঠামো বা স্ট্রাকচারআছে, কিন্তু বিশেষ নিয়ম দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে; আর তা হল জ্ঞাতির মধ্যে যৌনাচারের (Incest) ক্ষেত্রে। ইনসেস্টের (Incest) এই বিধি নিষেধ প্রাকৃতিক। দেরিদা এখানেই লেভি-স্ট্রসকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে (দেরিদা), কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয় ;সুতরাং ইনসেস্টের বিধি-নিষেধ ও প্রাকৃতিক নয়। বরং এই বিধি নিষেধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার একটি ইতিহাস আছে। লেভি-স্ট্রসের আলোচনা জ্ঞাতির মধ্যে যৌনচারের (ইনসেস্ট) বিধি-নিষেধ নামক সেন্ট্রারটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেরিদা স্ট্রসের আলোচনার এই সেন্টারটিকে চিহ্নিত করে দেখালেন যে, লেভি-স্ট্রসের কাঠামোবাদেও একটি সেন্টার আছে; কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা হয়নি বরং বাদ পড়ে গেছে।[২৬] দেরিদার মতে, নিয়মাবলির কাঠামো অসংখ্য হতে বাধ্য, কেননা একটি কাঠামোতে সবসময়ই কিছু-না-কিছু বাদ পড়ে যায়। আর এই বাদ পড়ে যাওয়া বা গ্রহণ বর্জনের বিষয়টি অনন্তহীনভাবে চলতে থাকে। প্রতিটি কাঠামোই তা সমাজের হোক বা অন্য যেকোনো বিষয়েরই হোক না কেন তা অবশ্যই গ্রহণ বর্জন সাপেক্ষ। আর এই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় সাবজেক্টের দ্বারা। সুতরাং প্রক্রিয়াটি সাবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী খেলামাত্র।[২৭]

উপসংহার: দেরিদার বিনির্মাণ পশ্চিমা দর্শনে বিদ্যমান প্রথা বা ঐতিহ্যের (Tradition) প্রতি একধরনের বিরোধিতা করার প্রবণতা। যে প্রবণতায় তিনি দর্শনের প্রচলিত রীতিকে ভাঙ্গতে চেয়েছেন। কেননা প্রচলিত রীতি অনুসারে, দার্শনিক অনুসন্ধানের (philosophical investigation) মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যে পৌঁছানো। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ সত্য অনুসন্ধানে (আবিষ্কারে) আগ্রহী নয় বা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতিও এর কোনো আগ্রহ নেই। তাঁর বিনির্মাণের বৈশিষ্ট্যই হলো অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট। আর এজন্যই দেরিদা মনে করেন, তাঁর বিনির্মাণ কোনো পদ্ধতি (Method) নয়; বরং এটা পড়া (reading), লেখা (writing)এবং চিন্তা (thinking) করার পন্থামাত্র। কেউ বিনির্মাণকে কোনো প্রকল্পের (Hypothesis) পরীক্ষায় বা যুক্তির পক্ষে ব্যবহার করতে পারেনা। বরং বিনির্মাণ হলো কোনো কিছুর অর্থ জিজ্ঞাসার একটা চলমান প্রক্রিয়া। এই বিনির্মাণের বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই। এটা অসম্ভব এবং সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়ের একটি আলাপ-আলোচনা মাত্র। দেরিদার বিনির্মাণের ধারণাটি বিকশিত হয়েছে মূলত ভাষাকে কেন্দ্র করে। ভাষাকে দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। যথা: বাক্ (মৌখিক) এবং লিখিত মাধ্যমে। পশ্চিমা অধিবিদ্যক দর্শনে মৌখিক ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেরিদা বিপরীত (ভিন্ন) মত প্রদান করে লিখিত ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে তিনি দেখিয়েছেন, লিখিত ভাষার যে টেক্সট, তার অর্থ ব্যাখ্যাভেদে ভিন্ন হতে পারে। আর ভিন্নমত প্রদান করা হলো দেরিদার বিনির্মাণের একটি রীতি। আর এই রীতি বোঝাতে গিয়ে দেরিদা যুগ্ম-বৈপরীত্যের (Binary-opposites) কথা বলেছেন। যুগ্ম-বৈপরীত্য অনুসারে, সবকিছুতেই পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় অবস্থান করে। যেমন: অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব, ভালো/মন্দ, চিরন্তন/পরিবর্তন, কথা/লেখা, যুক্তি/আবেগ, সংস্কৃত/প্রাকৃত, নর/নারী ইত্যাদি। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যেগুলো পরস্পর বিপরীত অর্থ ধারণ করে এবং এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই প্রথমটি উঁচু স্তরের এবং দ্বিতীয়টি নিচু স্তরের। ফলে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা

হয়। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ অনুসারে, দ্বৈত-বৈপরীত্যের যে ধারণা, তার কাঠামোতে পরিবর্তন হতে পারে। ফলে একটা পর্যায়ে এসে যে ধারণাকে নিচু স্তরের মনে করা হয়, তা উঁচু স্তরের বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আবার দেরিদা যে লিখিত ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, ভাষার সেই লিখিত রূপ হিসেবে যে চিহ্ন (sign) বা শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার অর্থ (meaning) লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা প্রত্যেক পাঠকের ব্যাখ্যা বা অনুবাদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সেই লিখিত শব্দ যেটাকে দেরিদা টেক্সট (text) বলেছেন, সেই টেক্সটের অর্থ কনটেক্সট পরিবর্তনে বা পাঠকভেদে ভিন্ন হতে পারে। আর এই বিষয়টা হলো দেরিদার ডিফারেন্স (Diffe′rance) সংক্রান্ত বিনির্মাণ। আবার দেরিদার বিনির্মাণ কাঠামোবাদের (Structuralism) বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে মূলত প্লেটোনিক (Platonic) দর্শনের সমালোচনা করেছেন। কেননা দেরিদার মতে, প্রতিটি কাঠামোর-ই একটা উৎস বা কেন্দ্র (Centre) থাকে। প্লেটনিক দর্শনে এই কেন্দ্র হলো সার্বিক ধারণা (Universal idea)। আর এই সার্বিক ধারণা থেকে বিশেষগুলো (Particulars) বের হয়ে আসে। কিন্তু সার্বিক ছাড়া বিশেষের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কেবলমাত্র সার্বিক ধারণা বা কেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে এবং কেন্দ্রই সত্য। কেন্দ্রের এই বিষয়টাকে আমরা যদি অর্থের (meaning) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে দেখা যায় কেন্দ্র অন্যান্য সকল সম্ভাব্য অর্থকেই (all possible meaning) অস্বীকার করে। যুগ্ম-বৈপরিত্য (Binary-opposites) অনুসারে কেন্দ্রের বিপরীত শব্দ হলো প্রান্ত (marginal)। সুতরাং প্লেটোনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র কেন্দ্রই সত্য আর প্রান্ত অসত্য এবং অর্থহীন। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ অনুসারে, অর্থের গতি অস্থির (unstable)। সুতরাং যুগ্ম-বৈপরীত্যের বিনির্মাণ অনুসারে বলা যায় কেন্দ্রের মতো প্রান্তও সত্য এবং প্রান্তেরও অর্থ আছে। অর্থাৎ কেন্দ্র এবং প্রান্ত উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্লেটোনিক দর্শনের সার্বিক এবং বিশেষ উভয়ই সত্য এবং উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য নির্দেশ:

১. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, (ST Martin's Press, New York, 1967), p.22.

২. মৃণালকান্তি ভদ্র, "জ্যাক-দেরিদার বিনির্মাণ প্রসঙ্গ ও হাইডেগার", *জ্যাক দেরিদা, পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১৩৩।

৩. *তদেব*, পৃ. ১৩৬।

৪. Jacques Derrida, *Of Grammatology*(1967), Trans. by Gayatri Chakravorty Spivak, (The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Corrected edt. 1997), pp. 10-11.

৫. "These disguises are not historical contingencies that one might admire or regret. Their movement was absolutely necessary" and that "within this logos [i.e. the western tradition of philosophical thought], the original and essential link to the phone′ has never been broken."*ibid*, p. 7.

৬. *ibid*, p. 7.

৭. *ibid*, p. 8.

৮. www.en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Derrida-on-deconstraction. Access date.07 June, 2013, 10:39am.

৯. www.en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Derrida-on-deconstraction. Access date.07 June, 2013, 10:39am.

১০. Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics* (1916), Trans. by Wade Baskin, (New York: New York Philosophycal Libarary, 1959), pp. 121-122.

১১. মঈন চৌধুরী, "দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনঃ তাত্ত্বিক বিচার ও সাহিত্য সমালোচনায় প্রয়োগ", *একবিংশ* (সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, বাংলাদেশ), পৃ. ১৬।

১২. *তদেব*, পৃ. ২০।

১৩. Jacques Derrida, *Positions*, Traslated and Annotated by Alan Bass, (2nd ed., 2002, introduction by C. Norris, London and New York : Continuum.), pp. 5-6.

১৪. *ibid*, p. 6.

১৫. Gerard Delanty, Modernity and Postmodernity Knowledge, Power and the Self, (SAGE Publications, London, 2000), p.140.

১৬. প্রবাল দাস গুপ্ত,"দেরিদা আর বিস্মরণ", *আলোচনা চক্র*, মনন বিশ্ব সংখ্যা: ১ (অষ্টম সংকলন, জুলাই ১৯৯৬ কলকাতা) পৃ. ১১৪।

১৭. *তদেব*, পৃ. ১১৫।

১৮. কল্যাণ সেনগুপ্ত, "দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা", *যোগসূত্র*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, (জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৪, কলকাতা) পৃ. ৭।

১৯. *তদেব*, পৃ. ৭।

২০. Jacques Derrida, *Positions*, Traslated and Annotated by Alan Bass, "Interview with Julia Kristeva", (The University of Chicago Press, 1982), pp.28-30.

২১. অজিত চৌধুরী, "একটি আধা অ্যাকাডেমিক (হাফ হার্টেড) প্রবন্ধ", *যোগসূত্র*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৪, কলকাতা), পৃ. ১৫।

২২. *তদেব*, পৃ. ১৫।

২৩. মঈন চৌধুরী, *তদেব*, পৃ. ১৭।

২৪. অজিত চৌধুরী, *তদেব*, পৃ. ১৫।

২৫. *তদেব*, পৃ. ১৬।

২৬. *তদেব*, পৃ. ১৬।

২৭. *তদেব*, পৃ. ১৭।

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ২১.১২.২০২৩